পতঙ্গের কথা



ওরিয়েন্ট লংম্যানস্

ব্রজ রায়চৌধুরী

পতঙ্গের কথা

আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্তেই, বাঁচবার জন্য লড়াই করে চলেছি, কোনো না কোনো শত্রুর সঙ্গে। আমাদের সব চাইতে মারাত্মক শত্রুদের মধ্যে, পতঙ্গ অন্যতম। এরা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রতাপে প্রবল।

বহুকাল আগে বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী লিনিয়াস বলেছিলেন—"একটি সিংহের চাইতেও আগে, তিনটি মাছি, একটি ঘোড়াকে সাবাড় করতে পারে।" শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই লিনিয়াসকে পাগল বলে মনে হচ্ছে? কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনটির দরকার নেই। একটি মাছিই যথেষ্ট। মাছি এপ্রিল মাসে ডিম পাড়তে শুরু করে। আর, এক একটি মাছি, প্রায় একশো পঞ্চাশটি ডিম পাড়ে। এই ডিম, পূর্ণাঙ্গ মাছিতে রূপান্তরিত হয়, মাত্র পনর দিনে। তার দশদিন পরেই আবার, এদের মধ্যে স্ত্রী-মাছি ডিম পাড়তে শুরু করে। এই ভাবে সারাটা গ্রীষ্মকাল, মাছির রাজ্যে চলে ডিম পাড়ার উৎসব। বন্যার মত বংশ বৃদ্ধি করে চলে এরা। এখন ভেবে দেখ ব্যাপারটা! হিসেব করে দেখা গেছে—একটি মাছির সব বংশধররা যদি বেঁচে থাকে আর ঠিকমত ডিম পাড়ে, তবে পাঁচ মাসে এদের সংখ্যা দাঁড়ায়—'পাঁচশো ষাট কোটি'। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, লিনিয়াসের কথার আসল মানে।

এতো হলো শুধু মাছির কথা। এই মাছি আবার পতঙ্গ-জগতের অতি সামান্য একটি সভ্য মাত্র। মাছি ছাড়া, জগতে আরো কত রকমের পতঙ্গ রয়েছে! প্রাণীবিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত, পৃথিবীতে প্রায় ছ'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার রকমের পতঙ্গ আবিষ্কার করেছেন। তাদের প্রায় সকলেরই, বংশ বিস্তারের অসীম ক্ষমতা। এখন ভেবে দেখ, যদি একটি মাছি থেকে এতোগুলো মাছি হতে পারে—তবে এই বিরাট সংখ্যার পতঙ্গ থেকে—কত, কত পতঙ্গ হচ্ছে! আর তাদের সংখ্যাই বা কত!

একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে—এরা সংখ্যায় কতো বেশী। মনে কর, খুব বড় একটি দাঁড়িপাল্লা তৈরি করে—তার একদিকে উঠল পৃথিবীর সব মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, পাখি ও সরীসৃপ। আর অন্যদিকে উঠল, পতঙ্গরা সব। কোনদিকটা ভারী হবে জান? পতঙ্গের দিকটা। শুধু ভারী নয়—অনেক, অনেক গুণ ভারী হবে, যদিও আমাদের পাল্লায় রয়েছে—হাতী, গরু, ঘোড়া, গণ্ডার, জলহস্তী, তিমি প্রভৃতি পৃথিবীর ভারী ভারী প্রাণীরা সব। এখন কল্পনা কর, এদের সংখ্যা!

পতঙ্গের সবই বিচিত্র! বিচিত্র তাদের আকার। বিচিত্র তাদের প্রকার। কেউ ছোট। কেউ বড়। কোনটাকে দেখলে ভয় হয়। কোনটাকে দেখলে ভালো লাগে। আর কিছু আছে, দেখলেই ঘেন্নায় গা ওঠে শিউরে। নয়তো রাগে শরীর জ্বলে।

ভীমরুল—তাকে দেখলেই ভয় হয়। প্রজাপতিকে ভালোবাসি। মাছি দেখলে ঘেন্নায় মরি। আর রাগ হয় মশা, ছারপোকা, উকুন—এদের দেখলে। ছারপোকা আর মশাতে জোট পাকিয়ে খায় আমাদের রক্ত। উকুনে খায় মাথা। এরা আমাদের পরম শত্রু।

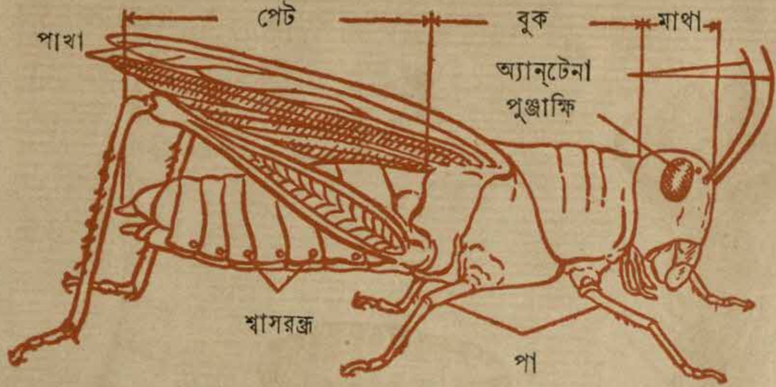
চাষীর শত্রু পঙ্গপাল—ফসল নষ্ট করতে এরা ওস্তাদ। পণ্ডিতের শত্রু উইপোকা। বই পত্র, খাতা কাগজ, কাঠের আসবাব, কেটেকুটে ছারখার করতে এদের জুড়ি নেই।

তাই বলে পতঙ্গরা সবাই আমাদের শত্রু, তা মনে করো না। অনেক মিত্রও আছে। এই সব পতঙ্গ বন্ধুদের কেউ কেউ আমাদের খাওয়ায় পরায়। যেমন মৌমাছি আর গুটিপোকা। মৌমাছি খাওয়ায় মধু। গুটিপোকা পরায় রেশম। লেডীবার্ড—মারাত্মক পোকার কবল থেকে ফুল, ফল আর ফসল রক্ষা করে।

এই পতঙ্গদের কাছে আমরা সব চাইতে বেশী ঋণী একটি ব্যাপারে। আমরা যে অত সুন্দর সুন্দর ফুল দেখে ও গন্ধ পেয়ে আনন্দ পাই, তার মূলে এই পতঙ্গ। এই পতঙ্গদের আকর্ষণ করবার জন্যই ফুলের সৌরভ আর সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের আকর্ষণে, মধুর লোভে—মৌমাছি, প্রজাপতি, যায় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে আর তাতে হয় পরাগমিশ্রণ। এর ফলেই, ফুল ফলে পরিণত হয়। কাজেই বুঝতে পারছ, এরা না থাকলে আমাদের কপালে ফুল আর ফল কিছুই জুটতো না।

পতঙ্গদের এককথায় বলা যেতে পারে—ত্রিভুবনচারী। জল মাটি আর আকাশ, এই তিন ভুবনেই ছড়িয়ে আছে এরা। প্রজাপতি ওড়ে আকাশে, পিঁপড়ে চরে মাটিতে, আর পণ্ড-স্কেটার জলে। মশারা আবার ত্রিভুবনের ঘাটে ঘাটে খেয়া দেন। ওড়েন আকাশে, খান মর্তে, আর ডিম পাড়েন গিয়ে জলে।

এদের জন্ম-পর্বটা ভারি মজার। পিঁপড়ে, মশা, মাছি, প্রজাপতি—এরা সবাই ডিম পাড়ে। ডিম থেকে প্রথমে বের হয় ক্রিমির মত বাচ্চা, এদের বলে শুক। ইংরেজি নাম লার্ভা (Larva)। ঐ যে প্রজাপতি এতো সুন্দর! দেখলেই ধরতে যাও—এদের লার্ভা দেখলে কিন্তু গা শিউরে উঠবে। ওদের বলে শুঁয়োপোকা। সারা গায়ে খালি শুঁয়োর কাটা। গায়ে ফুটলে যন্ত্রণার একশেষ। এই লার্ভারা হয় ভোজনবিলাসী। গুরুভোজনের ফলও হয় গুরুতর। বন্দী হয় একটি আবরণের ভেতরে। আবরণ সমেত এই পোকাটিকে তখন বলা হয় পিউপা (Pupa)। কিছুদিন পর, আবরণটি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে রঙীন প্রজাপতি! এ যেন ভোজবাজি। কাঁটাওয়ালা শুঁয়োপোকা থেকে বিচিত্র রঙের প্রজাপতি! ধূলিমুষ্ঠি থেকে সোনামুষ্ঠি! এই ভোজবাজির বাংলা নাম 'রূপান্তর' আর ইংরেজি নাম 'মেটামরফোসিস্' (Metamorphosis)।



পতঙ্গের দেহ

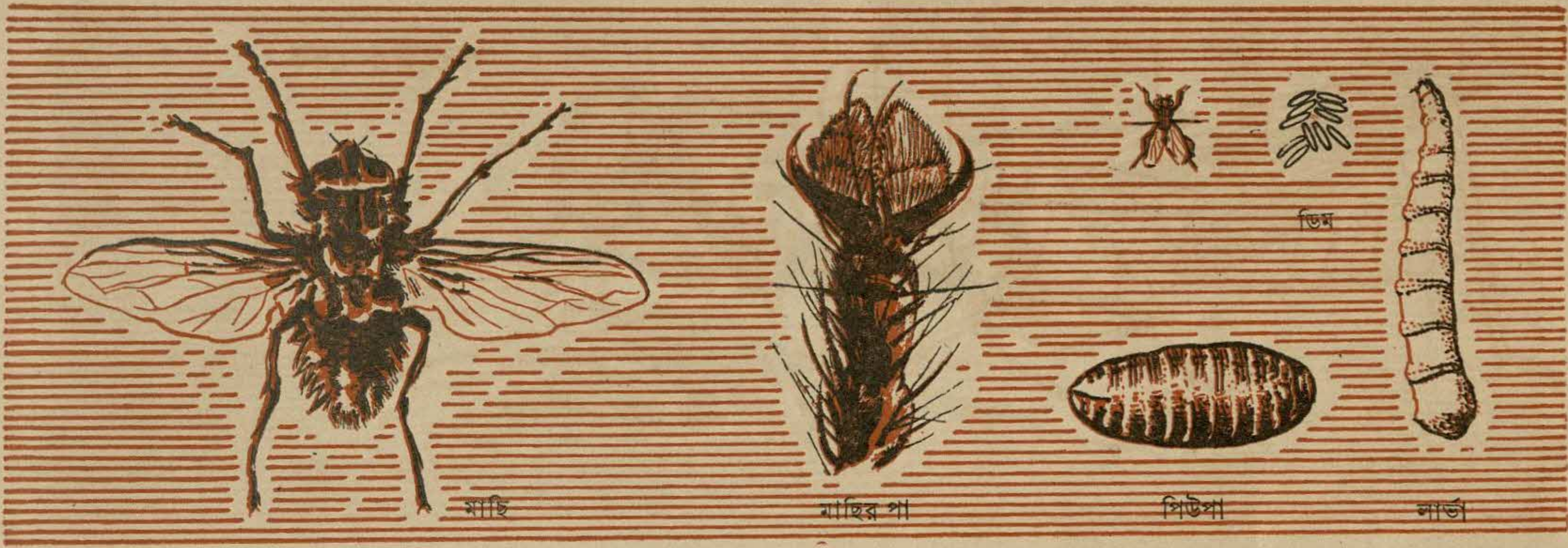
পতঙ্গের দেহে তিন ভাগ—মাথা (Head), বুক (Thorax), আর পেট (Abdomen)। এদের মাথায় আছে একজোড়া শুঁয়ো। তাদের ইংরেজিতে বলে অ্যান্‌টেনা (Antennae)। এই অ্যান্‌টেনা দিয়ে এরা জিনিষের আকার প্রকার ও আশপাশের সব বুঝতে পারে। অ্যান্‌টেনার ঠিক পিছনেই আছে একজোড়া চোখ। কিন্তু মজা হলো, এদের এক একটা চোখ তৈরি হয় অনেকগুলো ছোট ছোট চোখ দিয়ে। একটি চোখের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ অনেকগুলো চোখ থাকে বলে, পতঙ্গের চোখকে বলে পুঞ্জাক্ষি। ইংরেজিতে বলে কম্পাউণ্ড আই (Compound eye)।

সব পতঙ্গের মুখের গঠন কিন্তু এক রকম নয়। যে যেরকম খাবার খায়, সেই অনুযায়ী তৈরি হয় তাদের মুখ। কোনটার মুখে—চুসে খাবার জন্য নরম শুঁড়, কোনটার শুষে খাবার জন্য সূঁচের মত শক্ত হুল, আর কোনটার কেটে খাবার জন্য আছে—করাতের মত শক্ত দাঁত। সোজা কথায়, এদের মুখ নিজেদের খাবার রীতি অনুযায়ী তৈরী।

এদের বুকেও আবার তিন ভাগ। বুকের উপর দিকে থাকে পাখা আর নিচের দিকে পা। সাধারণতঃ দুজোড়া পাখা থাকে এদের। তবে কোন কোন পতঙ্গের একজোড়া খসে যায়। কোনটার আবার একদম পাখাই থাকে না। মানুষ যেমন দ্বিপদ, পশু যেমন চতুষ্পদ, পতঙ্গরা তেমনি ষট্‌পদ। সংস্কৃত শব্দ ষট্ মানে ছয়। অর্থাৎ, পতঙ্গের পা হলো ছখানা। এই পা তিনটে তিনটে করে আটকানো থাকে বুকের দুদিকে। পূর্ণবয়স্ক সব পতঙ্গের ছখানা পা থাকে।

পতঙ্গের নাক নেই। তার বদলে আছে কতগুলো ছোট ছোট ছিদ্র বা নালী। আর সেগুলো থাকে পেটের দুপাশে। এই নালী দিয়েই এরা নাকের কাজ করে। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়— এই এতটুকু পতঙ্গের শরীরেও আছে আমাদের মত মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, হৃদয় আর পরিপাক-যন্ত্র। এখানেই প্রকৃতির কারিগরির বাহাদুরি !

কোন কোন পতঙ্গের আবার পেটের একদম শেষে হুল থাকে, যেমন—মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদি।



মাছি

আমরা যখন যেদিকে তাকাই—এই মাছিদের দেখতে পাই। মানুষ আগে এদের ভালো করে জানতো না। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে, মানুষ প্রথম এদের ভাল করে চিনলো—আবিষ্কার করলো এদের দুষ্টামি। জানতে পারলো—এই ক্ষুদ্র প্রাণীই তাদের খাবার মধ্যে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে যায়, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর মৃত্যুর কবলে পড়ে।

আমাদের সব চাইতে মারাত্মক শত্রুদের মধ্যে, এদের স্থান সবার উপরে। ভীমরুলের মত এরা কামড়ায় না, প্যান্ প্যান্ করে না মশার মত—ভিজে বেড়ালের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আর পায়ে ও জিভে করে, যতরাজ্যের মারাত্মক রোগের জীবাণু নিয়ে আমাদের খাবার মধ্যে চালান করে।

মাছির একটি পা কেটে যদি কোনদিন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখ তো ব্যাপারটা বুঝবে। এরপর মাছি দেখলেই ঘেন্না হবে। আর মাছি বসা কোন জিনিস খেতে পারবে না। উপরের ছবি থেকে অবশ্য তোমাদের খানিকটা ধারণা হবে। এই মাছিদের সারা গায়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট চুল। এরা ময়লা আর আবর্জনার উপর বসে এই চুল আর জিভে করে রোগের জীবাণু ও



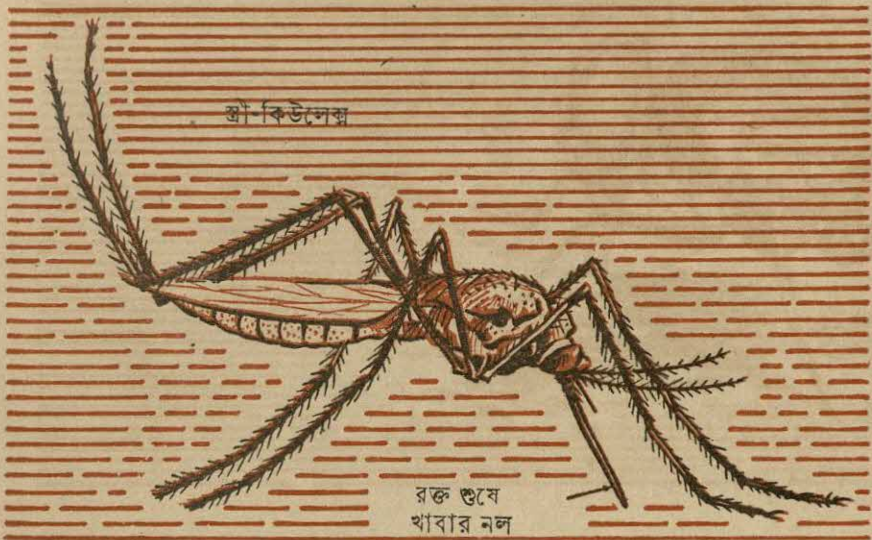
নোংরা নিয়ে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। এদের জিভ অনেকটা শুঁড়ের মত লম্বা। আর তাতে থাকে এক রকমের চটচটে রস। এই রসের সাহায্যে এরা শক্ত খাবার নরম করে খায়।

মাছিরা খুব হিসেব করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বেরিয়েই লার্ভাদের খাবার চাই। এই খাবার যেখানে মজুত থাকে, সেখানেই এরা ডিম পাড়ে—হিসেবটা ওই খানেই ; নইলে সংখ্যায় এরা বেহিসেবী।

আবর্জনার জায়গাই হচ্ছে মাছিদের হেড অফিস। সেখানে ওরা ডিম পাড়ে। ডিম থেকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে আসে লার্ভা। লার্ভারা আবার প্রায় পাঁচ ছয় দিন পরই পিউপাতে পরিণত হয়। আর তার পাঁচ ছয় দিন পর, পিউপা থেকে বেরিয়ে আসে পূর্ণাঙ্গ মাছি। এদের জন্ম আবর্জনায়, খাদ্য আবর্জনা, আর কাজ রোগ বিস্তার।

এদের দয়ায় আমাদের কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, যক্ষা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ হয়। কাজেই এই সব রোগের হাত থেকে বাঁচতে গেলে, প্রথমেই আমাদের মাছি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া দরকার। নোংরা জায়গা আর যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় সেখানে প্রায়ই পতঙ্গ নাশক বিষ ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তাতে ডিম ও লার্ভা মরে যাবে আর বংশবৃদ্ধি কিছুটা রোধ হবে। আর আমাদের খাবার জিনিষ যাতে সব সময় ঢাকা থাকে, তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

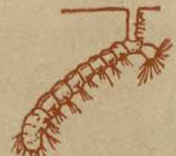
মশা



মশা আমাদের পরম শত্রু। নষ্টামির বেলায় মাছির পরই মনে হয় এদের স্থান। এদের জ্বালায় আমরা অস্থির। এদের মাথায় অ্যান্‌টেনা দুটোর মাঝখানে আছে একটি নল। স্ত্রী-মশারা ইন্‌জেক্‌সনের ছুঁচের মত এই নল আমাদের গায়ে ফুটিয়ে, রক্ত শুষে খায়। খুব ভাগ্যের কথা যে পুরুষ মশার নল ভোঁতা। মানুষের রক্ত তাই তাদের বরাতে নেই। শুধু গাছের রস খেয়েই তারা তুষ্ট। স্ত্রী-মশারা আমাদের রক্ত খায় আর মূল্য-স্বরূপ শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায় নানা রকম রোগের জীবাণু।

এরা সর্বব্যাপী। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই এদের পাওয়া যায়। তবে গরম দেশে সারা বছরই এদের দর্শন মেলে। আর শীতের দেশে, ঐ দেশের গরম সময়ে, এই মহারথীদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের স্বভাব একটু লাজুক ধরনের বলা যেতে পারে। কারণ রাত ছাড়া দিনের বেলা এদের প্রায় দেখা যায় না। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে এরা খুব ভালবাসে। তবে খাবার ব্যাপারে কিন্তু মোটেই লাজুক নয় এরা। তখন একদম বেপরোয়া, নির্দয়।


ডিম


লার্ভা


পিউপা

মশা নানা রকমের। তার মধ্যে কিউলেক্‌স্ আর এনোফিলিস প্রধান। কিউলেক্‌স্ মশা আমাদের শরীরে ফাইলেরিয়ার জীবাণু চালান করে। ফাইলেরিয়া হচ্ছে গোদ রোগ। কিউলেক্‌স্ এই রোগের জীবাণু এক দেহ থেকে অন্য দেহে রপ্তানী করে।

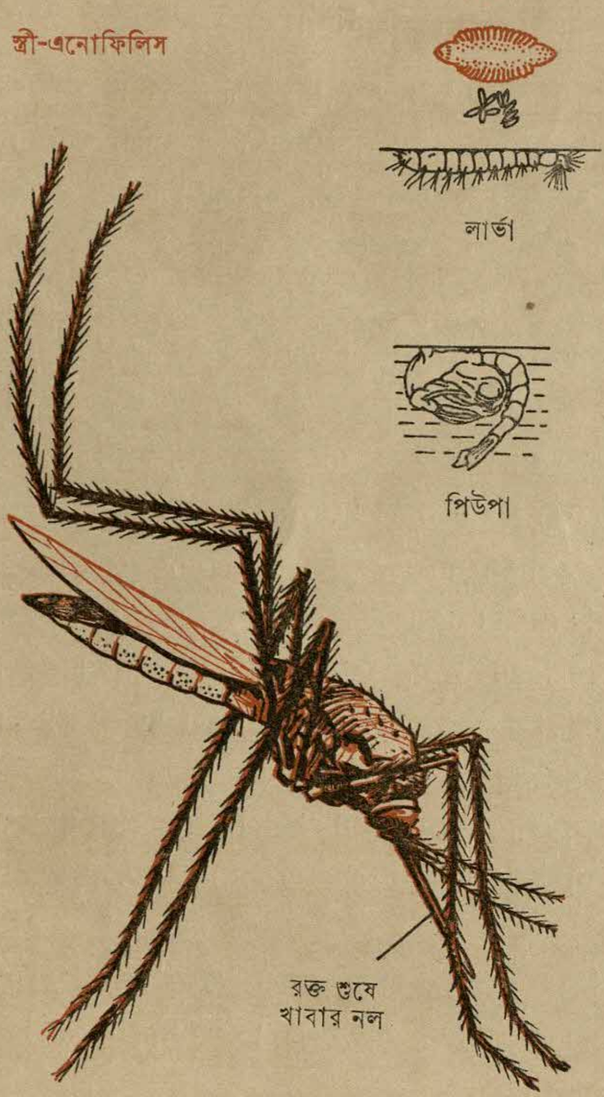
মশারা থাকে ডাঙ্গায়। কিন্তু ডিম পাড়ে গিয়ে জলে। খানা, ডোবা, পুকুর, ভাঙ্গা হাঁড়ি, কলসী অথবা যে কোন জায়গায়—পরিষ্কার অথবা নোংরা জলে, ডিম পাড়ে এরা। সব মশারা কিন্তু এক ভাবে ডিম পাড়ে না। নানা রকম মশা নানা ভাবে ডিম পাড়ে।

ডিম

লার্ভা

পিউপা

স্ত্রী-এনোফিলিস



রক্ত শুষে খাবার নল

কিউলেক্সের ডিম জলের উপরে একসঙ্গে জড় হয়ে ভেসে থাকে। লার্ভারা থাকে কোনাকোনি ভাবে, জলের একটু নিচে। লার্ভা অবস্থায় এরা জলের খুব ছোট ছোট জীব খেয়ে বেঁচে থাকে। এই সময় এদের খাওয়ার বিরাম থাকে না। সারাক্ষণ কেবল খেয়েই চলে। কিন্তু পিউপাতে পরিণত হবার পর কিছুই খায় না এরা। আর খায় না বলেই, এই অবস্থায় এদের মুখও থাকে না।

কিউলেক্সের যেমন ফাইলেরিয়ার ব্যবসা, এনোফিলিসের তেমনি ম্যালেরিয়ার ব্যবসা। এনোফিলিস মশা আমাদের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু চালান করে। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু কিন্তু এদের দেহে তৈরি হয় না। আসলে এরা এক দেহ থেকে অন্য দেহে রপ্তানী করে এই জীবাণু। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ম্যালেরিয়ার জীবাণু ভেতরে থাকা সত্ত্বেও এই রোগ হয় না এদের।

এনোফিলিসের ডিম আলাদা আলাদা ভাবে জলে ভাসে। কিউলেক্সের মত এক সঙ্গে ভাসে না। আর লার্ভারা থাকে জলের একটু নিচে, সমান্তরাল ভাবে। কোনাকোনি ভাবে থাকে না। এনোফিলিস আর কিউলেক্সের বসার ধরনেও তফাত আছে। ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ্য কর। তাহলে এদের ডিম, লার্ভা, পিউপা ও বসার ধরন—সব কিছুর তফাত বুঝতে পারবে।

এদের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে, কোথাও যাতে জল আবদ্ধ না থাকে তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা দরকার। কারণ এরা ডিম পাড়ে জলে। জল না পেলে ডিম পাড়তে পারে না এরা। তাই বংশবৃদ্ধি হতে পারে না। তাছাড়া খানা, ডোবা প্রভৃতি জায়গায় মাঝে মাঝে কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এতে জলের উপর একটি আবরণ পড়ে। এই আবরণ ভেদ করে মশারা ডিম পাড়তে পারে না। আর লার্ভারাও নিশ্বাস নিতে পারে না, তাই মরে যায়।



পুরুষ-গঙ্গাফড়িং



পেছনের পায়ের বলের সারি

স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং



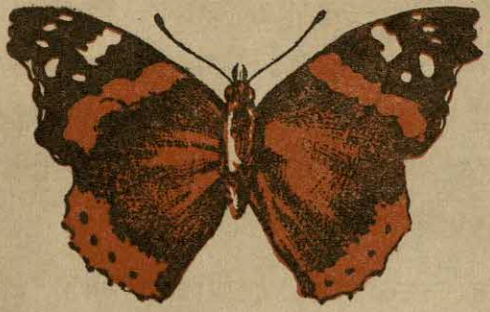
গঙ্গাফড়িং

গ্রীষ্মের দিনে—মাঠে, নদীর ধারে, কাশ বনে বা ঘাস বনে গেলেই, শুনতে পাবে গঙ্গাফড়িংয়ের ডাক। নির্জন বনে এদের এই একঘেয়ে আওয়াজ যেন নীরবতাকে আরো নিবিড় করে তোলে।

আমারা বলি গঙ্গাফড়িং ডাকছে। আসলে কিন্তু এরা মোটেই ডাকতে পারে না। কোন পতঙ্গই ডাকতে পারে না, এদের স্বরযন্ত্রই নেই। হয়তো বলবে—মশা তা হলে কি করে ডাকে ? মশাও ডাকে না। ওরা যে প্যান্ প্যান্ করে, সে তাদের পাখার শব্দ। পাশের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে—গঙ্গাফড়িংয়ের লম্বা পা দুখানার ভেতর দিকে রয়েছে, আলপিনের মাথার বলের মত একসারি বল। কোথাও বসলে, এরা এই লম্বা পা দুখানাকে উপরের দিকে তোলে আর নামায়। ফলে এই বলের সঙ্গে পাজরার ঘসা লেগে একরকম শব্দ হয়। আমরা সেই শব্দ শুনেই বলি—গঙ্গাফড়িং ডাকছে।

এই গঙ্গাফড়িং দুই জাতের। এক জাতের অ্যান্টেনা দেহের চাইতে লম্বা আর এক জাতের ছোটো বা বেঁটে। ছোটো অ্যান্টেনার গঙ্গাফড়িংয়ের মধ্যে আবার আর এক জাত আছে। তাদের খ্যাতি পৃথিবীর সব জায়গায়। তাদের বলে পঙ্গপাল (Locust)।

এই পঙ্গপাল আমাদের পরম শত্রু। বিরাট শস্যক্ষেত্র নষ্ট করতে এদের মোটেই সময় লাগে না। অনেক সময় এদের উপদ্রবে ঘাসের অভাবে, পশুদের না খেয়ে মরতে হয়। এশিয়া আর আফ্রিকাতে এই পঙ্গপালের উপদ্রব খুব বেশী।



প্রজাপতি

ডিম লার্ভা





পিউপা

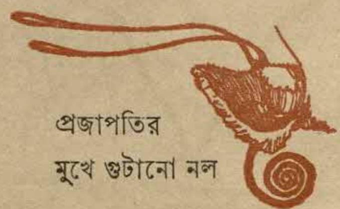
পিউপার উপর বসে প্রজাপতি বিশ্রাম করছে

প্রজাপতি

ছেলেবেলায় প্রজাপতির পিছনে ছোটে নি, এমন ছেলেমেয়ে বোধ হয় খুব কমই আছে। সুন্দর সবসময়ই আকর্ষণ করে। তাই এই প্রজাপতির দল যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করে আসছে—কবি, শিল্পী আর সাহিত্যিকদের।

এদের উজ্জ্বল রঙ আর বিচিত্র পাখা, ছোটোদের অতি সহজেই মুগ্ধ করে। আর তারা—জল, কাদা, কাটা তুচ্ছ করে ছুটে চলে এই উড়ন্ত ফুলের পিছনে। ফুলই বটে! শুধুমাত্র দুজোড়া পাখা হলে একে ফুলই বলা চলতো। কিন্তু ফুলের মত পাখা দুজোড়ার মাঝখানে রয়েছে, ছোট্ট একটি কীট। তাই প্রাণীবিজ্ঞানীরা এই উড়ন্ত ফুলকে ফেলেছেন পতঙ্গের দলে।

এদের মধ্যে যারা দিনের বেলা ফুলে ফুলে ওড়ে, মধু খেয়ে বেড়ায়, আর রাতে ঘুমায় তাদের আমরা বলি প্রজাপতি। আর যারা রাতে উড়ে বেড়ায় ও দিনে ঘুমায় তাদের বলি মথ। কিন্তু অনেক মথ আবার দিনের বেলাও ওড়ে। কাজেই প্রজাপতি আর মথকে আলাদা ভাবে চিনবার সব চাইতে ভালো উপায় হচ্ছে—এদের অ্যান্‌টেনা আর বসার ধরন লক্ষ্য করা। প্রজাপতির অ্যান্‌টেনা সরু তারের মত—মাথার দিকটা মোটা। আর এরা যখন বসে, তখন এদের পাখা দুজোড়া এক হয়ে লেগে থাকে—মেলে থাকে না। মথের বেলা ঠিক উল্টো—তারা বসলে পাখা দুজোড়া মেলে থাকে। এক হয়ে লেগে থাকে না। তাদের অ্যান্‌টেনা অনেকটা খুব ছোট্ট পালকের মত। পরের পাতায় ছবিগুলো দেখ, তফাত বুঝতে পারবে।



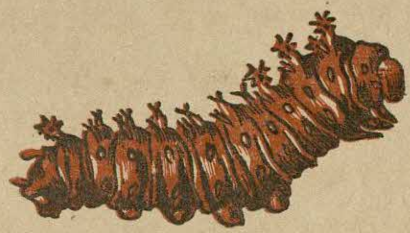
প্রজাপতির মুখে গুটানো নল



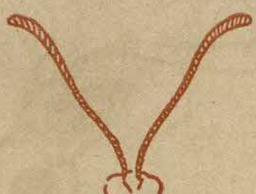
সিল্ক মথ



গুটি



লার্ভা



প্রজাপতির অ্যান্টেনা



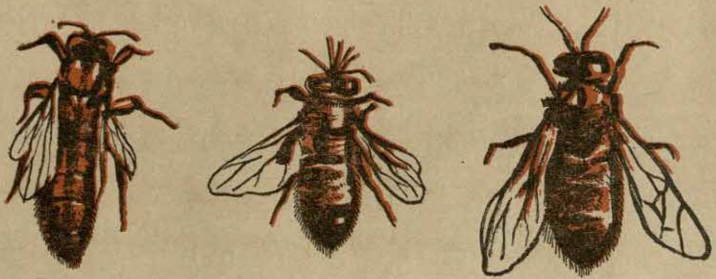
মথের অ্যান্টেনা

প্রজাপতি আর মথের সারা দেহের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো তাদের পাখা দুজোড়া। এদের রঙীন ফুলের মত পাখায় হাত দিলে দেখবে, হাতে গুঁড়ো গুঁড়ো রঙ লেগে আছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে, এই গুঁড়োগুলো দেখবে লক্ষ লক্ষ রঙীন আঁশ। এই রকম অসংখ্য আঁশ দিয়েই তৈরী হয় এদের পাখা আর তার বিচিত্র রঙ।

এদের মুখে আছে ফিতের মত একটি লম্বা নল। এই নল ঘড়ির স্প্রীং-এর মত গুটানো থাকে। খাবার সময় এরা এই নল খুলে, ফুলের মধু শুষে খায়। অন্যান্য পতঙ্গের মত এদেরও ডিম থেকে হয় লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা, আর পিউপা থেকে হয় রঙীন প্রজাপতি বা মথ। তবে লার্ভা থেকে পিউপাতে রূপান্তরিত হতে, এরা নিজেদের দেহের চারদিকে, মুখের লালা দিয়ে একটি আবরণ তৈরি করে। এই আবরণকে আমরা বলি গুটি। মথের মধ্যে কিছু আছে, যাদের মুখের লালা সূতোতে পরিণত হয়। আর সেই সূতো দিয়ে তারা তৈরি করে গুটি। আমরা রেশম বা সিল্কের যে কাপড় ব্যবহার করি, তার সূতো পাওয়া যায় এই গুটি থেকেই।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রজাপতি সাধারণতঃ বেশী রঙীন আর বড় হয়। সব চাইতে বড় সাইজের প্রজাপতি হচ্ছে প্রায় দশ ইঞ্চি আর মথ পাঁচ ইঞ্চি।

প্রজাপতি দেখে আমরা আনন্দ পাই ; আর মথেরা পরায় রেশম। কাজেই এরা আমাদের বন্ধু। তবে বন্ধুদের ছেলেপুলেরা আমাদের উপর বড় উৎপাত করে। পেটুক লার্ভারা খাওয়া ছাড়া আর কিছু জানে না—ফলে আমাদের গাছপালা সব খেয়ে শেষ করে। আর তার জন্য বছরে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়।

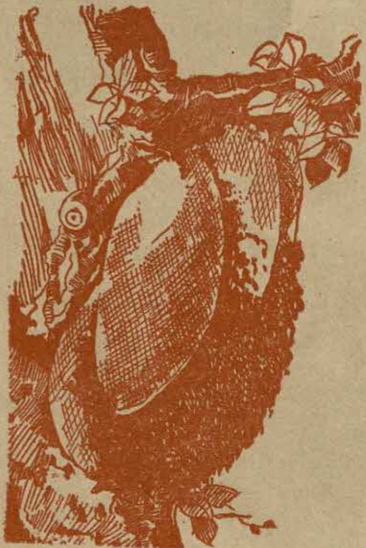




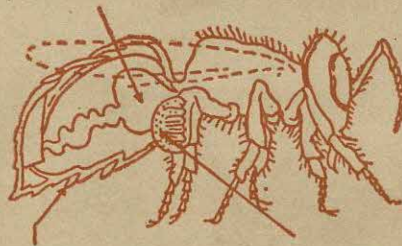
মৌমাছি

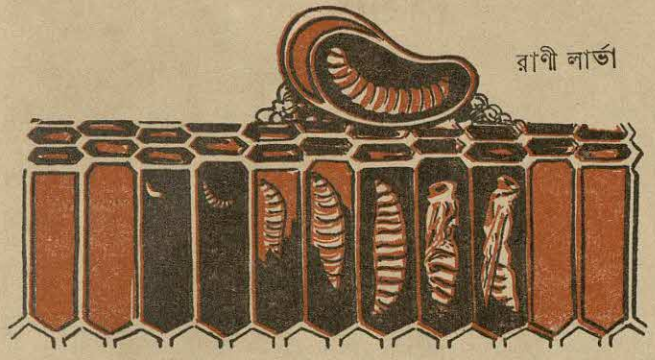
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মধুকে বলা হয়েছে 'সর্বরোগহর'। কবিরাজেরা প্রায় সকল ওষুধই কিছু না কিছু মধুর সঙ্গে খেতে বলেন। কেউ কেউ বলেন, রোজ সকালে এক চামচ করে মধু খেলে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। এহেন যে অমৃত তা তৈরি হয় মৌমাছির পেটে।

মৌমাছির প্রধান খাদ্য ফুলের মধু বা মিষ্টিরস আর পরাগ। মৌমাছি ফুল থেকে যে মধু নেয়, আর আমরা যে মধু খাই, তা মোটেই এক নয়। এদের মুখে খুব ছোট একটি লোমশ শুঁড় আছে। তার নাম লেবিয়া (Labia)। এই লেবিয়া দিয়ে শ্রমিক মৌমাছিরা ফুলের মিষ্টিরস শুষে খায়। এই রস জমা করার জন্য এদের পেটে একটি আলাদা থলে আছে। ফুলের মিষ্টিরস ঐ থলেতে জমা হয়ে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মধুতে পরিণত হয়। এই মধু এরা চাকে জমা করে। আর চাক থেকে আমরা জমা করি বোতলে।


মৌচাক

মৌমাছির বাড়িকে আমরা বলি মৌচাক। চাকে থাকে তিন রকমের মৌমাছি—স্ত্রী, পুরুষ আর শ্রমিক। পুরুষ মৌমাছি দেখতে মোটাসোটা, মাথা বড়। রাণীর বা স্ত্রী-মৌমাছির মাথা ছোট, পেট লম্বা। আর শ্রমিক ছোটখাটো। শ্রমিকরা মেয়ে, কিন্তু তাদের বাচ্চা হয় না। এদের স্ত্রী, পুরুষ আর শ্রমিক সকলেরই দুজোড়া পাখা আছে। শ্রমিক মৌমাছি ঘরে-বাইরে সব কাজ করে। শ্রমিকের মস্তিষ্ক রাণী বা পুরুষের চাইতে অনেক বড়। আর দেহের ভেতরটা যেন, একটা রাসায়নিক কারখানা। সে কারখানায় প্রধানতঃ তিন রকমের কাজ হয়—ফুলের মিষ্টিরস থেকে





মৌচাকের ভেতরে ডিম, লার্ভা আর পিউপা

মধু হয়, রাণীর জন্য খাবার তৈরি হয়, আর তৈরি হয় মধু থেকে মোম। এই মোম দিয়েই এরা চাক তৈরি করে।

এদের চাকে বা বাড়িতে থাকে হাজার হাজার খোপ। এই খোপই হচ্ছে এদের বাড়ির আলাদা ঘর। ঘরগুলো হয় ছয়-কোনা। রাণী-মৌমাছি এই সব ঘরের মধ্যে একটি করে ডিম পেড়ে রাখে। তিনদিন পর ডিম থেকে হয় লার্ভা। লার্ভা অবস্থায় এদের খাওয়া দাওয়ার ভার নেয় শ্রমিক নার্স-বোনেরা। লার্ভারা পাঁচদিন পর আর খেতে চায় না। তখন শ্রমিকরা এদের ঘরের দরজা বা মুখ মোমের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়। এই অবস্থায় এদের বলে পিউপা। পিউপা অবস্থায় বদ্ধ ঘরে প্রায় বারোদিন বন্দী হয়ে থাকে এরা। বন্দীদশায় হাত, পা, চোখ, মুখ, পাখা সব কিছু তৈরি হয় এদের। আর যেই বন্দীদশা শেষ হয়, অমনি এক শুভ মুহূর্তে, ঘরের দরজা ভেঙ্গে পাখা মেলে এরা ওড়ে আকাশে। বেরিয়ে পড়ে মধুর সন্ধানে ফুল থেকে ফুলে।

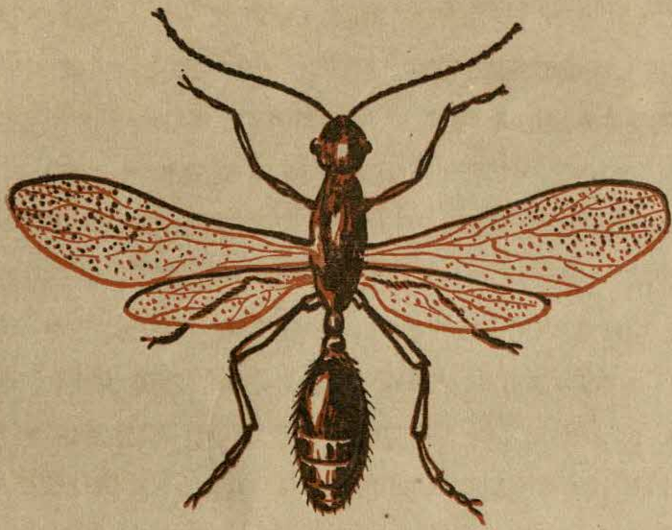
রাণীদের আবার চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, জন্ম-মৃত্যু সবই আলাদা। তাঁরা রাণী কি না! তাই। শ্রমিক আর পুরুষের ঘরে জন্মালে তাঁদের আভিজাত্য থাকে না। তাই, চাকের উপরে, বেশ বড়োসড়ো ঘরে ভালো ভালো খাবার খেয়ে, জন্মান এরা।

মৌমাছির সারা দেহে এক রকমের লোম আছে। মিষ্টিরস পানের সময় এই লোমগুলোতে ফুলের পরাগ লেগে যায়। এদের পিছনের পায়ে, পরাগ জমা করার জন্য ঝুড়ির মত এক রকমের পাত্র আছে। মধুপান শেষ করে এরা সারাদেহের পরাগ-রেণুকে পায়ের লোমের সাহায্যে আঁচড়ে, ঐ পরাগ ঝুড়িতে জমা করে। আর পরাগ-রেণুকে, পরে এরা লার্ভাদের খাদ্যে পরিণত করে।

এদের চাকে সাধারণতঃ একটি রাণী থাকে। নতুন রাণী-মেয়েদের, এদের মা প্রায়ই মেরে ফেলতে চায়। আর মারতে না পারলে, চাকে ফিরে আসতে বাধা দেয়, অথবা নিজে কিছু শ্রমিক নিয়ে নতুন আশ্রয়ের খুঁজে বেরিয়ে পড়ে। রাণীর জীবনকাল এক থেকে তিন বছর।

শ্রমিকরা বাঁচে অতি অল্পদিন—মাত্র ছয় সপ্তাহ। এদের কর্মমুখর সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিহাসটি বড় করুণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা শ্রমই তাদের জীবন—ছুটি নেই, বিশ্রাম নেই; কর্মময় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাদের ছুটি। মৃত্যুর মধ্যেই তাদের পরম বিশ্রাম।

পিঁপড়ে



পুরুষ



শ্রমিক

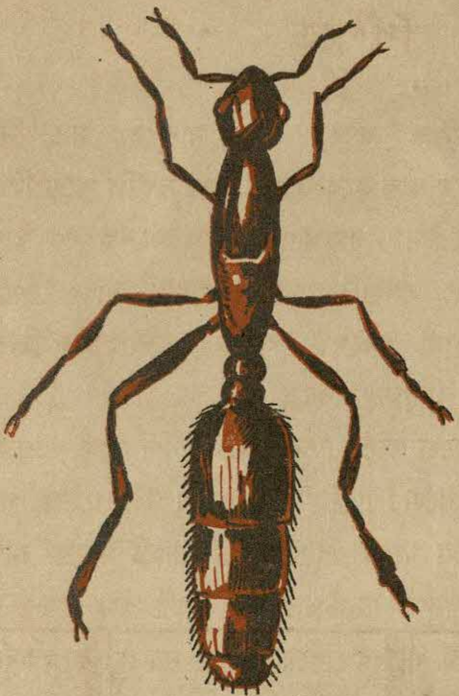
পিঁপড়ে সামাজিক জীব। ঠিক মানুষের মত, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে এরা। তবে সব পিঁপড়ে মিলে, এক সঙ্গে দল বেঁধে বাস করে না। আলাদা আলাদা অনেক দল স্বাধীন ভাবে বাস করে। আলাদা দলগুলির মধ্যে আবার ভাবও বিশেষ নেই—যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই আছে। নিজেদের ভিতরে কিন্তু এরা কখনও ঝগড়া, মারামারি করে না।

প্রতিটি দলের মধ্যে থাকে তিন রকমের পিঁপড়ে—শ্রমিক, পুরুষ আর রাণী বা স্ত্রী-পিঁপড়ে। স্ত্রী আর পুরুষ পিঁপড়ের পাখা থাকে। আর প্রত্যেক দলে থাকে সাধারণতঃ একটি করে রাণী। রাণী দেখতে বড়সড়। পুরুষ ছোটখাটো। রাণী আর পুরুষ দুই বড় অলস। কোন কাজকর্ম এদের দিয়ে হবার নয়। কাজকর্ম যা কিছু, সব করে শ্রমিক পিঁপড়ে। দিনরাত কাজ করে এরা। কাজ এদের অনেক রকমের—রাণীকে দেখাশুনা করা, ডিমের রক্ষণাবেক্ষণ করা, খাদ্য সংগ্রহ করা। আবার দরকার পড়লে, আপন দল রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা।

পিঁপড়ের দেহ অন্যান্য পতঙ্গের মতই। গোল মাথা, পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্‌টেনা সবই আছে। তবে এদের পুঞ্জাক্ষি দুটি প্রায় অকেজো। কেন না এরা মোটেই চোখের ব্যবহার করে না। দেখে পথ চলার অভ্যাস এদের প্রায় কারোও নেই। অ্যান্‌টেনা দিয়ে অনুভব করে পথ চলে এরা। অনেক পিঁপড়ে আবার মোটেই দেখতে পায় না—অন্ধ।

অন্যান্য পতঙ্গের মত, এদেরও ডিম থেকে হয় লার্ভা। লার্ভা থেকে পিউপা। আর পিউপা থেকে বেরিয়ে আসে পূর্ণাঙ্গ

রাণী



পিঁপড়ে। তবে এদের প্রথম দিকের ডিম থেকে জন্মায় কেবল শ্রমিক। আর শেষের দিকের ডিম থেকে জন্মায় পাখাওয়ালা পুরুষ আর স্ত্রী-পিঁপড়ে। রাজারাণীরা আবার পরিণত বয়সে বিয়ের জন্য ওড়েন আকাশে। কিন্তু কথায় আছে—'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে'। কাজেই, আকাশে উড়লে পাখি আর কোথাও বসলে ব্যাঙ অথবা টিকটিকি এদের ধরে খায়। রাণীদের মধ্যে যে ক'জন বাঁচে, তাদের শ্রমিকরা ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। আর যাদের শ্রমিকরা পায় না, তারা পাখা দুটো খসিয়ে, গর্ত খুঁড়ে মাটির অনেক নিচে চলে যায়। কিছুদিন পর, তারা ডিম পাড়তে শুরু করে সেখানে। ডিম থেকে প্রথমে জন্মায় শ্রমিক শিশু। এই সময় রাণীর কোন খাবার জোটে না। শ্রমিক-শিশুরা বড় হয়েই তাদের দুর্বল মাকে তরল খাবার এনে খাওয়ায়। তারপর বাড়িঘর বড় করে, খাবার যোগাড় করে। এখন থেকে সব কাজের ভার নেয় এই শ্রমিকরা। রাণী প্রথমে প্রচুর শ্রমিকের জন্ম দেয়। তারপর শেষের দিকে, পুরুষ ও রাণী জন্মাবার জন্য ডিম পাড়তে শুরু করে। এইভাবে গড়ে ওঠে এদের নতুন সংসার বা দল। এদের রাণীর জীবনকাল প্রায় পনর বছর। অন্যরা সে তুলনায় বাঁচে অতি অল্পদিন।

পিঁপড়ের বাড়ি তৈরির প্রণালী খুব সুন্দর। এরা অনেক রকমের বাড়ি তৈরি করে। যারা মাটির নিচে থাকে, তারা অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর তৈরি করে। তার কোন ঘরে ডিম, কোন ঘরে লার্ভা, আর কোন ঘরে নিজেরা থাকে। খাবার রাখার জন্য আমাদের মত আলাদা ভাড়ার ঘর থাকে এদের। আর রাণীর জন্য থাকে তার মধ্যে বেশ বড়সড় একটি ঘর। প্রত্যেক ঘরে যাওয়া আসা করার পথও থাকে। যারা গাছে থাকে, তারা পাতা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী খুব চমৎকার বাড়ি তৈরি করে।



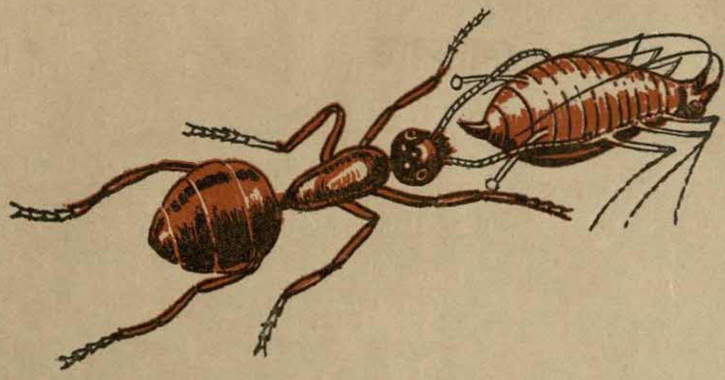
লার্ভা



ডিম



পিউপা



পিঁপড়ে এ্যাফিসের গায়ে অ্যান্‌টেনা বুলিয়ে মিষ্টিরস খাচ্ছে।

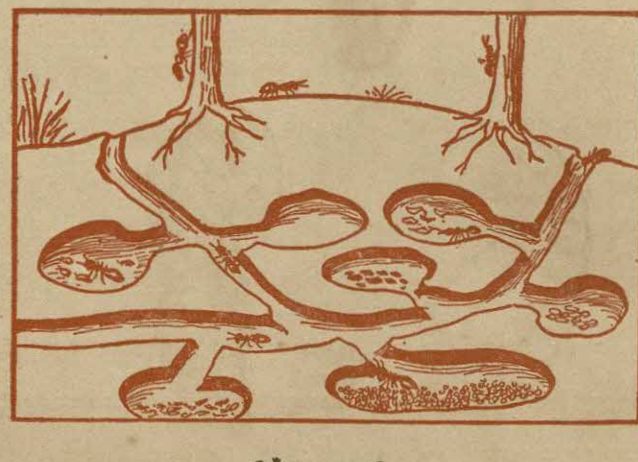
সবচেয়ে আশ্চর্য এদের খাদ্য সঞ্চয় প্রণালী। আমরা যেমন দুধের জন্য গরু পোষি, এরাও তেমনি মধুর জন্য এ্যাফিস্ (Aphis) নামে একরকমের কীট পোষে। এই কীট দেখতে খুব ছোট, গাছের পাতায় থাকে। আর মজার ব্যাপার হলো—পিঁপড়েরা যখন এই এ্যাফিসের গায়ে অ্যান্‌টেনা বুলিয়ে দেয়, তখন এদের গা থেকে একরকমের মিষ্টিরস বেরিয়ে আসে। পিঁপড়েরা এই রস খেতে খুব ভালবাসে। এদের থাকার জন্য পিঁপড়েরা আলাদা ঘর তৈরি করে। বাইরে থেকে এদের রুচিমত খাবার এনে খাওয়ায়। আর সবসময় এদের শরীরের প্রতি যত্ন নেয়।

শুনলে আরো আশ্চর্য হবে যে, আমাদের মত এরাও ফসলের জন্য চাষ করে। আমেরিকায় একজাতের পিঁপড়ে আছে, তারা তাদের বাড়িতে একরকম গাছের পাতা এনে জড় করে রাখে। এই পাতা পচে যে সার হয়, তা থেকে ফাঙ্গাস্ (যাকে আমরা ব্যাঙের ছাতা বলি) তৈরী হয়। পিঁপড়েরা খুব মজা করে এই ফাঙ্গাস্ খায়।

এদের ডাক্তারী বুদ্ধিরও অভাব নেই। এরা নিজেদের লার্ভাকে প্রায় রোজ রোদ আর হাওয়া লাগাবার জন্য বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে। এরা আশ্চর্য পতঙ্গ! কি সুন্দর বুদ্ধি খাটিয়ে বসবাস করে!

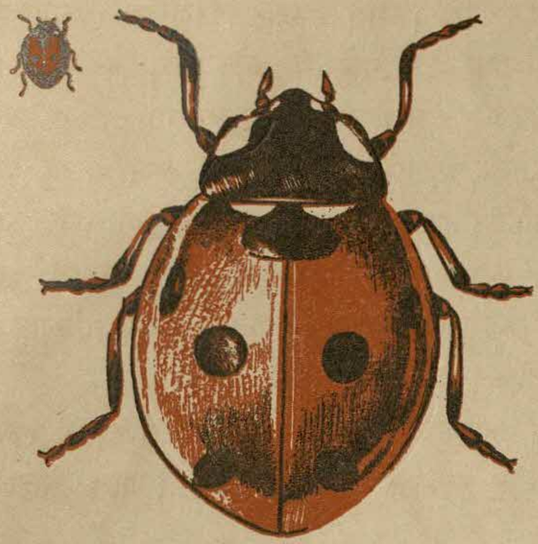
মৌমাছির মত এদেরও জীবনে বিশ্রাম বা ছুটি বলে কোন জিনিষ নেই, মৃত্যুই একমাত্র বিশ্রাম। এদের রাজ্যে সব চাইতে বড় নিয়ম হলো—'হয় কাজ নয় মৃত্যু'।

পিঁপড়ে আমাদের উপকার আর অপকার দুই করে। আমাদের মিষ্টি খাবার সাবধানে না রাখলে প্রায়ই তা নষ্ট করে দেয়। আর উই, ছারপোকা প্রভৃতির ডিম খেয়ে তাদের বংশ ধ্বংস করে আমাদের প্রভূত উপকার করে।



পিঁপড়ের বাড়ি

লেডিবার্ড



এর নাম শুনে তোমাদের হয়তো মনে হচ্ছে কোন এক অজানা পাখি। আসলে কিন্তু এরা মোটেই অজানা নয়, আর পাখিও নয়। এদের তোমরা প্রায়ই লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে প্রভৃতি গাছের পাতায় দেখতে পাও। নাম হয়তো জান না। এরা এক জাতের গুবরে-পোকা। গুবরে-পোকাকে ইংরেজিতে বলে বীট্‌ল্ (Beetle)। পৃথিবীতে প্রায় দু'লক্ষ রকমের গুবরে-পোকা আছে। আর এই ক্ষুদ্র লেডিবার্ড তাদেরই একজন।

আগেই বলেছি, পতঙ্গ-জগতে আমাদের শত্রু আর মিত্র—দুই আছে। এরা হচ্ছে শেষের দলে; আমাদের পরম বন্ধু। লেডিবার্ড দেখতে খুব ছোট। এদের উজ্জ্বল রঙ, পাখার ডিজাইন আর চালাক চতুর চট্‌পটে ভাব সবাইকে মুগ্ধ করে। চাষীরা এদের উপর খুব খুশী—কেন না এরা তাদের পরম বন্ধু।

ফসলের সব চাইতে বড় শত্রু হচ্ছে এ্যাফিস্ (aphis)। এ্যাফিস্ একরকমের ছোটো পোকা। পিঁপড়েরা মধুর জন্য এদের বাড়িতে পোষে। এরা প্রায় সব ফসলেই থাকে আর তাকে নষ্ট করে। যেখানে এরা দলে দলে থাকে, সেখানে লেডিবার্ড গিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ ডিম পেড়ে রাখে। ডিম থেকে হয় লার্ভা। এই লার্ভারা তাদের বাপমায়ের মতই চট্‌পটে আর সুন্দর। এদের গায়ের রঙ সাধারণতঃ ধূসরনীল অথবা ধূসরবেগ্‌নী। লার্ভারা রোজই প্রচুর এ্যাফিস্ ধরে খায়। খাওয়ায় এরা বড়দের চাইতে কিছু কম যায় না। আর এই ভাবে শত্রুর বংশ ধ্বংস করে, এরা আমাদের ফসল রক্ষা করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই লেডিবার্ড আমদানী রপ্তানী হয়। শত্রুর কবল থেকে ফুল ফল অথবা ফসল রক্ষা করতে, সকলেই এদের সাহায্য নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, তিন হাজার লেডিবার্ড এক একর পরিমাণ জমির ফসল রক্ষা করতে পারে। এরা অনেক রকমের—তবে সবই দেখতে প্রায় একরকম—তফাত শুধু গায়ের বিন্দুর সংখ্যাতে।

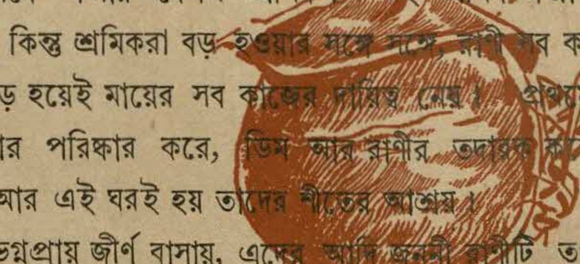


ভীমরুল

মৌমাছির হুল আছে—আবার মধুও আছে। শাসন আর সোহাগ দুই আছে, সে হলো কড়ামিঠে। তাকে সহ্য হয়—ভালোও লাগে। কিন্তু ভীমরুল? তার খালি হুল। হুলে আছে বিষ। মধুর নাম গন্ধও নেই। তাই একে দেখলেই ভয় পাই।

শীতের সময় এরা একটু কাবু হয়ে পড়ে, পাতার ঝোপের মধ্যে বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। বসন্তের হাওয়া বইতে সুরু করলেই, রাণী ভীমরুলদের চমক লাগে; ঘুম ভেঙ্গে পাখা মেলে ওড়ে আকাশে। এখন তাদের অনেক কাজ—নতুন করে বাড়ি বানাতে হবে। বাড়ির জায়গা খুঁজতে থাকে তারা। গাছের বড় শাখা, পাতার ঘন ঝোপ, গাছের কোটর অথবা আমাদের ঘরের চালের বাখারি—এই সব হচ্ছে এদের পছন্দসই জায়গা। জায়গা পছন্দ হলে, বাড়ি বানানো সুরু হয়। এদের বাড়ি অনেকটা মৌচাকের মতই। তবে মৌচাকটা বেআব্রু—এরা পর্দানশীন। এরা এদের চাকের বাইরে একটা আবরণ দিয়ে নেয়।

চাকের ভেতরে, প্রত্যেক কোঠায় রাণী একটি করে ডিম পেড়ে রাখে। কিছুদিন পর ডিম থেকে হয় লার্ভা। তখন রাণী তাদের খাবার যোগাড় করে। পিঁপড়ের মত, ভীমরুলেরও প্রথমদিকের ডিম থেকে জন্মায় কেবল শ্রমিক। এই শ্রমিক জন্মাবার আগ পর্যন্ত রাণী উদয়াস্ত কাজ করে। কিন্তু শ্রমিকরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রাণী সব কাজ বন্ধ করে। একমাত্র ডিম পাড়া ছাড়া আর কোন কাজ সে করে না। শ্রমিকরা বড় হয়েই মায়ের সব কাজের দায়িত্ব নেয়। প্রথমেই এরা বাড়ি বড় করে। তারপর শ্রমিক-বোনদের জন্য খাবার যোগাড় করে, ঘর-দোর পরিষ্কার করে, ডিম আর রাণীর তদারক করে। গ্রীষ্মের শেষের দিকে, শ্রমিকরা তাদের রাণী-বোনদের জন্য ঘর তৈরি করে দেয়। আর এই ঘরই হয় তাদের শীতের আশ্রয়।



পরিণত বয়সে নতুন রাজারাণীরা তাদের জয় যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে—আর ভগ্নপ্রায় জীর্ণ বাসায়, এদের আদি জননী রাণীটি তখন কিছু বৃদ্ধ শ্রমিক নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। সে এসেছিল নতুন সৃষ্টি করতে। নতুনেরা এলো—তার কাজও শেষ হলো।

উই



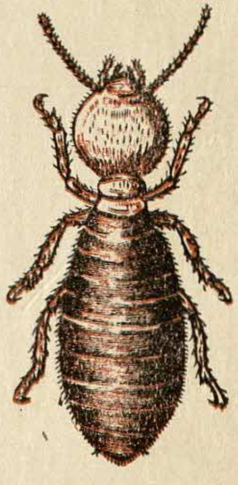
রাণী

রাজা

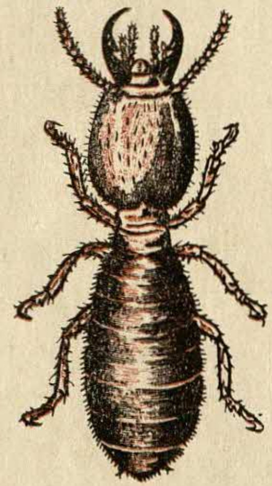
পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া, কেবলমাত্র সামাজিক পতঙ্গ—যেমন পিঁপড়ে, মৌমাছি, ভীমরুল আর উই, একসঙ্গে মিলেমিশে, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে বাস করে। তার মধ্যে মানুষ প্রায় দশ লক্ষ বছর, আর পিঁপড়ে, মৌমাছি, ভীমরুল সাত কোটি বছর, এই পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। এদের মধ্যে সব চাইতে বেশী দিন রাজত্ব করছে উই ; প্রায় বিশ কোটি বছর। এদের কাছে মানুষ নবজাত শিশু মাত্র।

এরা গরম দেশের অধিবাসী। আফ্রিকা হচ্ছে এদের প্রধান ঘাটি। বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীতে প্রায় দুহাজার রকমের উই আছে। উইকে ইংরেজিতে সাধারণতঃ 'হওয়াইট্ অ্যাণ্ট' বলা হয়। কিন্তু মজা হলো—সাদা পিঁপড়ে যার নাম, সে পিঁপড়েও নয় আর তার রঙও ঠিক সাদা নয়। এ যেন কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন'।

এদের বাড়ি তৈরির প্রণালী খুব সুন্দর। বাড়ির দুপাশ দিয়ে এরা সরু নালা বা পাইপের মত নল তৈরি করে মাটির অনেক নিচে নিয়ে যায়। সেখান থেকে জল নিয়ে আসে এরা। আর এই একই নলকে আবার মাটির উপরে নিয়ে আসে, খাবার যোগাড় করার জন্য। কাঠ, কাগজ আর কাপড়ই হচ্ছে এদের প্রধান খাদ্য।



শ্রমিক



সৈনিক

পিঁপড়ের মত, এদেরও প্রতি দলে বা বাড়িতে থাকে তিন রকমের উই—স্ত্রী, পুরুষ আর শ্রমিক। শ্রমিকদের মধ্যে এক দল থাকে সৈনিক। শ্রমিক আর সৈনিক দুই অন্ধ। রাজা আর রাণীর কিন্তু চোখ আছে—দেখতে পায়। তবে রাণী দেখতে পেলে কি হবে, কিছুকাল পরে হাটতে পারে না মোটেই। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে বয়েস হলে ক্রমশঃ এদের পেটের কি আকার হয়। শ্রমিকরা সব সময় রাণীর কাজে ব্যস্ত থাকে। আর রাণী থাকে সব সময় ডিম পাড়তে ব্যস্ত। শুনলে অবাক হবে যে, এদের রাণী, প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে ডিম পাড়ে। রাণীর জীবনকাল পনর থেকে কুড়ি বছর।

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্‌স্ লি
রেজিষ্টার্ড অফিস : ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট্, বোম্বাই-১
১।২৪, আসফ আলী রোড, নয়া দিল্লী
৩৬-এ, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২
গানফাউণ্ড্রী রোড, হায়দ্রাবাদ
১৭, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা

লংম্যান্‌স্ গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড
৪৮, গ্রস্‌ভেনর ষ্ট্রীট, লণ্ডন ডব্লিউ-১
এবং
নিউ ইয়র্ক, টরণ্টো, কেপ টাউন ও মেলবোর্ন

ORIENT LONGMANS

প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৬১

দাম ১·৫০ টাকা

ছেপেছেন : শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জী, কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬